# Learning Resource

**B.Sc. 4th Semester General**
**Economics**
**DSC 1DT: Features of Indian Economy**

*Prof. Swastick Sen Chowdhury*

---

# Unit-VII: Foreign Trade

## ভূমিকা

আমরা যেসব দ্রব্য ও সেবাকর্ম ভোগ করি তার অনেকগুলি আমাদের দেশে উৎপাদিত হয়না। যেমন আপেল, গুঁড়ো দুধ, গাড়ী ইত্যাদি। কিছু দ্রব্য ও সেবাকর্ম আমাদের দেশে উৎপাদিত হয়। কিন্তু এসব উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ বিদেশ থেকে আনা হয়। যেমন ধান উৎপাদনে ব্যবহৃত সেচযন্ত্র, সুতা উৎপাদনে ব্যবহৃত তুলা, বিমান ভ্রমনের জন্য বিমান ইত্যাদি। আবার আমাদের দেশে যে সকল পণ্য উৎপাদিত হয় তার সব আমরা ব্যবহার করি না - আমরা বিদেশীদের কাছে বিক্রয় করি। যেমন তৈরী পোশাক, চিংড়ী ইত্যাদি। এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের দ্রব্য ও সেবাকর্মের এরূপ লেনদেনকে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য বলে। কোন কোন দেশের জন্য আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হলেও একদেশ থেকে অন্যদেশে পণ্য সামগ্রী অবাধে চলাচল করতে পারে না - কিছু বিধি নিষেধ থাকে। আমরা এ অধ্যায়ে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব, অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের পার্থক্য, আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি এবং অবাধ ও সংরক্ষিত বাণিজ্যের স্বপক্ষে/বিপক্ষে যুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করব।

### আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য কাকে বলে ?

পৃথিবীতে কোন দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। একটি দেশে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসে। আবার একটি দেশ থেকে বিভিন্ন পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যায়। পৃথিবীর দুটি সার্বভৌম দেশের মধ্যে দ্রব্য ও সেবাকর্মের লেনদেনকে আন্ত র্জাতিক বাণিজ্য বলে। একটি দেশ যে সকল পণ্য তুলনামূলকভাবে কম খরচে উৎপাদন করতে পারে সে সকল পণ্যের উৎপাদনে বিশেষায়ন করে এবং এ সকল পণ্যের উদ্বৃত্ত অংশ অপরাপর দেশের উদ্বৃত্ত পণ্যের সঙ্গে বিনিময় করে। একটি দেশ যে সকল দ্রব্য ও সেবাকর্ম অন্যান্য দেশের নিকট বিক্রয় করে তাকে রপ্তানি বলে।

একটি দেশ অন্যান্য দেশের নিকট থেকে যে সকল দ্রব্য ও সেবাকর্ম ক্রয় করে তাকে আমদানী বলে। একটি দেশ যে সকল দ্রব্য ও সেবাকর্ম আমদানী করে সেগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। কতগুলো আমদানী আছে যা একটি দেশ উৎপাদন করতে পারে কিন্তু অন্যান্য দেশ তা তুলনামূলকভাবে কম খরচে উৎপাদন করতে পারে। আর কতগুলো আমদানী আছে যা এই দেশে উৎপাদিত হয় না। এ ধরনের আমদানীকে অপ্রতিযোগিতামূলক আমদানী বলে।

### আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব

বর্তমানকালে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব সকল দেশে সমান নয়। নিচের সারণী থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পাওয়া যায়। সারণী থেকে দেখা যায় যে বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ইত্যাদি ছোট দেশসমূহে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য জাতীয় অর্থনীতিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ। বেলজিয়ামে রপ্তানি জাতীয় উৎপাদনের মোট ৬৯%। বড়দেশ সমূহের জাতীয় অর্থনীতিতে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার অনেক বড় যেখানে বিচিত্রমুখী পণ্যের বিপুল চাহিদা রয়েছে, অর্থনীতি অনেক বৈচিত্র্যময়। যেখানে বহুধরনের পণ্য উৎপাদিত হয়। এসব দেশের অর্থনীতি একাই অনেক দেশের অর্থনীতির সমান।

ভারতের অর্থনীতির রপ্তানী নির্ভরতা কম। ভারত জিডিপি-এর শতকরা মাত্র ১০ ভাগ রপ্তানী করে। ভারতের অর্থনীতি অনুন্নত হলেও বড় ও বৈচিত্র্যময়। বাংলাদেশের অর্থনীতি জিডিপি-এর মাত্র ১০ ভাগ রপ্তানী করতে সক্ষম হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে বাংলাদেশ ১৯৯৪ সালে জিডিপি'র ২০.৪ ভাগ আমদানী করেছে। এসব আমদানীর অধিকাংশ মূলধনী দ্রব্য এবং মাধ্যমিক পণ্য যা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয়। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বাংলাদেশের জন্য আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেসকল অর্থনীতি আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যে বড় ভূমিকা পালন করে সেসব অর্থনীতিকে মুক্ত অর্থনীতি বলে।

নির্বাচিত দেশের রপ্তানী, ১৯৯৪

**দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা হার**

| দেশ | রপ্তানী |
|---|---|
| বেলজিয়াম | ৬৯ |
| নেদারল্যান্ড | ৫১ |
| কানাডা | ৩০ |
| যুক্তরাজ্য | ২৫ |
| ফ্রান্স | ২৩ |
| ইটালী | ২৩ |
| জার্মানী | ২২ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ১০ |
| জাপান | ৯ |
| বাংলাদেশ | ১২ |
| ভারত | ১২ |

উৎস- বিশ্বব্যাংক

## অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য

একটি দেশের দুটি অঞ্চলের মধ্যে দ্রব্য ও সেবাকর্মের লেনদেনকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। যেমন, বাংলাদেশের সিলেট বিভাগ থেকে চা চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় যায়। আবার চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকে আম সিলেট অঞ্চলে যায়। দুটি স্বাধীন দেশের মধ্যে দ্রব্য ও সেবাকর্মের লেনদেনকে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য বলে। যেমন- বাংলাদেশ থেকে ভারতে জামদানী শাড়ী রপ্তানী এবং ভারত থেকে বাংলাদেশে সুতা আমদানী। একটি দেশের দুটি অঞ্চলের মধ্যে পণ্যের লেনদেনের কারণ এবং দুটি দেশের মধ্যে পণ্যের লেনদেনের কারণ মূলত: একই। দুটি দেশের মধ্যে যে কারণে বাণিজ্য হয় সে কারণগুলো একই দেশের দুটি অঞ্চলের ক্ষেত্রে বাণিজ্যের জন্যও প্রযোজ্য। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যদি অভ্যন্তরীণ লেনদেন সম্পর্কে পাঠ করে বাণিজ্য সম্পর্কে জানা যায় তাহলে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে পৃথকভাবে পাঠ করার প্রয়োজন কি? অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের মধ্যে মৌলিক মিল থাকা সত্ত্বেও কিছু পার্থক্য আছে যেজন্য এ সম্পর্কে আলাদাভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে।
এ পার্থক্যগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল।

## অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য

### ১. বিভিন্ন মুদ্রা

একটি দেশের অভ্যন্তরে সকল প্রকার বাণিজ্য একই মূদ্রায় সম্পন্ন হয়। যেমন- বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সকল প্রকার লেনদেন টাকায় সম্পন্ন হয়। কিন্তু দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যে দুটি মূদ্রা জড়িত থাকে। বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তিত হতে পারে এবং বর্তমানকালে তা পরিবর্তিত হয়। যেমন- ১৯৭১-৭২ সালে টাকা ও ডলারের বিনিময় হার ছিল ১ আমেরিকান ডলার=৭.৩০ টাকা; কিন্তু ১৯৯৭-৯৮ সালের মাঝামাঝি অবস্থায় তা দাঁড়ায় ১ ডলার=৪৬.৫০ টাকায়। বিনিময় হারের পরিবর্তনের ফলে নানারূপ জটিলতা ও নীতি নির্ধারণে সমস্যা দেখা দেয়।

### ২. রাজনৈতিক উপাদান

কোন দেশের সরকার তার নাগরিকদের কল্যাণের জন্য চিন্তা করে। কিন্তু তার গৃহীত নীতির দ্বারা বিদেশী নাগরিকগণ কিভাবে প্রভাবিত হবে সে সম্পর্কে চিন্তা থাকে না। একটি দেশ তার সুবিধার জন্য বিদেশ থেকে আমদানীকৃত পণ্যের উপর শুল্ক আরোপ করতে পারে বা অন্যকোন রূপ বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। এর ফলে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্য চলাচল বাধাগ্রস্থ হয় যা একটি নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে ঘটে না।

### ৩. উপাদানের সচলতা

কোন দেশের অভ্যন্তরে শ্রম প্রয়োজনমত একস্থান থেকে অন্যস্থানে কর্মস্থান পরিবর্তন করতে পারে এবং চাকুরী নিতে পারে। কিন্তু এক দেশ থেকে অন্য দেশে অভিবাসনের পথে নানারূপ বাধানিষেধ আরোপ করা হয়; বিদেশী নাগরিকদের চাকুরী গ্রহণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করা হয়।

দেশের অভ্যন্তরে মূলধনের সচলতার তুলনায় আন্ত:দেশীয় সচলতা কম। মূলধনি দ্রব্য একদেশ থেকে অন্যদেশে পরিবহন করা ব্যয় সাপেক্ষ। বৈদেশিক বিনেয়োগের উপর নানারূপ বিধিনিষেধ থাকতে পারে। তাছাড়া বিদেশে বিনিয়োগ কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ যেমন-বিদেশের সরকার কর্তৃক স্বত্বনিরসনের ঝুঁকি এবং বিনিময় হার পরিবর্তনের ঝুঁকি।

# পরম সুবিধা তত্ত্ব

দুটি দেশের মধ্যে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য হয় কারণ দুটি দেশই বাণিজ্য থেকে লাভ করে। বাণিজ্য থেকে লাভ দেখানোর জন্য ডেভিড রিকার্ডো তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব প্রদান করেন। তবে এই তত্ত্ব আলোচনার পূর্বে এ্যাডাম স্মীথ প্রদত্ত পরম সুবিধা তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন আছে। যদি দুটো দেশের মধ্যে একটি দেশে একটি পণ্য এক একক উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ উপকরণ লাগে তা অন্য দেশটির তুলনায় কম হয় তাহলে প্রথমোক্ত দেশটির ঐ পণ্যে পরম সুবিধা আছে বলা হয়।

আমরা দুটি দেশ বাংলাদেশ ও আমেরিকা, দুটি পণ্য - তৈরী পোশাক ও কম্পিউটার এবং একটি উপকরণ - শ্রম বিবেচনা করি। এই দুটি পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ নিচের সারণীতে দেখানো হয়েছ।

**পরম সুবিধা**

| প্রতি একক উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ | বাংলাদেশ | আমেরিকা |
|---|---|---|
| তৈরী পোশাক | ২ | ৪ |
| কম্পিউটার | ১০ | ৮ |

সারণী থেকে দেখা যায় যে, এক একক তৈরী পোশাক উৎপাদনে বাংলাদেশে আমেরিকার তুলনায় শ্রম কম লাগে (২<৪)। অনুরূপভাবে, এক একক কম্পিউটার উৎপাদনে বাংলাদেশের তুলনায় আমেরিকায় শ্রম কম লাগে (৮<১০)। সুতরাং বাংলাদেশের তৈরী পোশাক উৎপাদনে পরম সুবিধা এবং আমেরিকার কম্পিউটার উৎপাদনে পরম সুবিধা আছে। যদি এ অবস্থায় বাংলাদেশ তৈরী পোষাক উৎপাদনে এবং আমেরিকা কম্পিউটার উৎপাদনে বিশেষায়ন করে এবং উৎপাদিত পণ্য বিনিময় করে তাহলে উভয় দেশই লাভবান হবে। মনে করি, দু'দেশের মধ্যে ১ একক কম্পিউটার এর সঙ্গে ৩ একক তৈরী পোশাক বিনিময় হয়। বাংলাদেশ ৬ একক শ্রম ব্যবহার করে ৩ একক তৈরী পোষাক উৎপাদন করে এবং এর বিনিময়ে ১টি কম্পিউটার পায় যা দেশে উৎপাদন করলে ১০ একক শ্রম লাগত। বাণিজ্যের ফলে বাংলাদেশের ৪ একক শ্রম বাঁচে যা সে আরও পোষাক উৎপাদনে ব্যবহার করতে পারে।

অপরদিকে আমেরিকা ৮ একক শ্রম ব্যবহার করে ১টি কম্পিউটার উৎপাদন করে তার বিনিময়ে ৩ একক তৈরী পোষাক লাভ করে যা দেশে উৎপাদন করলে ১২ একক শ্রম লাগত। এভাবে আমেরিকারও লাভ হয়। সুতরাং বাণিজ্যরত দুটি দেশের কোন পণ্য উৎপাদনে পরম সুবিধা থাকলে বাণিজ্য উভয় দেশের জন্য লাভজনক হয়। আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের অনেকটাই পরম সুবিধার ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে দুটি দেশের মধ্যে একটি দেশ যদি অন্য দেশের তুলনায় সকল পণ্য উৎপাদনে বেশি দক্ষ হয় তাহলে দেশ দুটির মধ্যে লাভজনক বাণিজ্য হবে কিনা? সাধারণভাবে মনে হতে

পারে, যে কোন পণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশের শ্রমিকের তুলনায় আমেরিকার শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা এত বেশি যে বাংলাদেশের পক্ষে আমেরিকায় কোন পণ্য রপ্তানী করা সম্ভব নয়। কিন্তু তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব বলে যে, এরূপ অবস্থায়ও লাভজনক বাণিজ্য সম্ভব। যদিও আমেরিকার তুলনায় বাংলাদেশ প্রতিটি পণ্য উৎপাদনে পরম অসুবিধাজনক অবস্থায় আছে, বলা হয় যে এসবের মধ্যে যে পণ্যটি উৎপাদনে বাংলাদেশ সবচেয়ে কম অদক্ষ সেটিতে বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা আছে। আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের জন্য পরম সুবিধা অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়, যা প্রয়োজন তা হচ্ছে তুলনামূলক সুবিধা।

## তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব

সুবিধা তত্ত্ব অনুসারে যদি প্রতিটি দেশ যে দ্রব্য তুলনামূলকভাবে কম খরচে উৎপাদন করতে পারে (বা যাতে তুলনামূলকভাবে কম অদক্ষ) সে দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষায়ন এবং তা রপ্তানী করে তাহলে প্রতিটি দেশ উপকৃত হবে। অনুরূপভাবে যদি প্রতিটি দেশ যে দ্রব্য তুলনামূলকভাবে বেশী খরচে উৎপাদন করতে পারে (বা যাতে তুলনামূলকভাবে বেশি অদক্ষ) সে দ্রব্য আমদানী করে তাহলে প্রতিটি দেশ উপকৃত হবে।

## তুলনামূলক সুবিধার ব্যাখ্যা

প্রদত্ত উপাত্ত দ্বারা তত্ত্বটি সহজে ব্যাখ্যা করা যায়।

**তুলনামূলক সুবিধা**

| প্রতি একক উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ | বাংলাদেশ | আমেরিকা |
|---|---|---|
| তৈরী পোশাক | ২ | ১ |
| কম্পিউটার | ১০ | ২ |

সারণী থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও কম্পিউটার উভয় দ্রব্য উৎপাদনে পরম অসুবিধায় আছে, কারণ ২>১ এবং ১০>২। কিন্তু বাংলাদেশের অসুবিধা তৈরি পোষাক উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে কম, কারণ ২/১<১০/২ বা ২<৫। সুতরাং বলা যায় বাংলাদেশের তৈরী পোশাক উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা এবং কম্পিউটার উৎপাদনে আপেক্ষিক অসুবিধা আছে।

অপরদিকে আমেরিকা তৈরি পোষাক ও কম্পিউটার উভয় পণ্য উৎপাদনে পরম সুবিধায় আছে, কারণ ১<২ এবং ২<১০। কিন্তু আমেরিকার সুবিধা কম্পিউটার উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে বেশি, কারণ ১০/২>২/১। অর্থাৎ আমেরিকার সুবিধা তৈরি পোশাক উৎপাদনে দ্বিগুণ কিন্তু কম্পিউটার উৎপাদনে পাঁচগুণ। সুতরাং বলা যায়, আমেরিকার কম্পিউটার উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা এবং তৈরি পোষাক উৎপাদনে আপেক্ষিক অসুবিধা আছে।

পরম সুবিধা তত্ত্ব অনুসারে, এক্ষেত্রে উভয় দেশের জন্য পারস্পরিকভাবে লাভজনক বাণিজ্য সম্ভব নয়। কিন্তু তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব অনুসারে বাণিজ্য সম্ভব। এ অবস্থায় যদি বাংলাদেশ তৈরি পোষাক উৎপাদনে বিশেষায়ন করে এবং তা তৈরি পোষাকের বিনিময়ে রপ্তানি করে তাহলে উভয় দেশই লাভবান হবে।

বাণিজ্য থেকে লাভ নির্ধারণের জন্য মনে করি বাংলাদেশ তৈরি পোষাক এবং আমেরিকা কম্পিউটার উৎপাদনে বিশেষায়ন করে। মনে করি বাংলাদেশ তৈরি পোষাক উৎপাদন ৫ একক বৃদ্ধি করে এবং আমেরিকা তৈরি পোষাকের উৎপাদন ৪ একক হ্রাস করে। তাহলে তৈরি পোষাকের বিশ্ব উৎপাদন ১ একক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে কম্পিউটারের উৎপাদন হ্রাস পায় এবং আমেরিকায় কম্পিউটারের উৎপাদনে পরিবর্তন করতে

হয়। বাংলাদেশে ৫ একক তৈরি পোষাক উৎপাদনের জন্য ৫×২=১০ একক শ্রম লাগে এবং এজন্য কম্পিউটার উৎপাদন ১০/১০=১ একক হ্রাস করতে হয়। অপরদিকে আমেরিকায় তৈরি

পোষাকের উৎপাদন ৪ একক হ্রাসের ফলে ৪×২=৮ একক শ্রম বাঁচে এবং এর দ্বারা ৮/৪=২ একক কম্পিউটার উৎপাদন করা যায়। সুতরাং শ্রম পুন:বরাদ্দ করার ফলে কম্পিউটারের বিশ্ব উৎপাদন ১ একক বাড়ে। এভাবে উৎপাদনে নিম্নলিখিত পরিবর্তন ঘটে :

**তুলনামূলক সুবিধা**

| | বাংলাদেশ | আমেরিকা | মোট |
|---|---|---|---|
| তৈরী পোশাক | +৫ | -৪ | +১ |
| কম্পিউটার | -১ | +২ | +১ |

মোট কথা, মোট শ্রমের পরিমাণ স্থির রেখে, উভয় দেশ শ্রম পুন: বরাদ্দ করে তৈরি পোষাকের উৎপাদন ১ একক এবং কম্পিউটারের উৎপাদন ১ একক বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

## বাণিজ্য থেকে লাভ

বাণিজ্যের পূর্বে বাংলাদেশে ১ একক তৈরি পোষাক উৎপাদন করতে ২ একক শ্রম লাগে, যেখানে ১ একক কম্পিউটার উৎপাদন করতে ১০ একক শ্রম লাগে। সুতরাং কম্পিউটার তৈরি পোষাকের চেয়ে ব্যয়সাধ্য হবে - ১ একক কম্পিউটারের খরচ ১০/২=৫ একক তৈরি পোষাকের খরচের সমান। অনুরূপভাবে আমেরিকায় ১ একক কম্পিউটারের খরচ ২/১=২ একক তৈরি পোষাকের খরচের সমান হবে। এখন মনে করি, উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য হবে। যদি বাংলাদেশ ৫ একক তৈরি পোষাকের কম খরচে ১টি কম্পিউটার আমদানী করতে পারে তাহলে তা তার জন্য লাভজনক হবে। অনুরূপভাবে যদি আমেরিকা ১টি কম্পিউটার রপ্তানী করে বিনিময়ে ২ এককের বেশি তৈরি পোষাক আমদানী করতে পারে তা তার জন্য লাভজনক হবে। আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যে তৈরি পোষাকের সঙ্গে কম্পিউটারের বিনিময় হার ২ থেকে ৫ এককের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

মনে করি আর্ন্তজাতিক বাজারে ১ একক কম্পিউটারের বিনিময়ে ৩ একক তৈরি পোষাক পাওয়া যায়। এ অবস্থায় বাংলাদেশের জন্য তৈরি পোষাক রপ্তানী করে কম্পিউটার আমদানী করা লাভজনক হবে। বাংলাদেশ ৩ একক তৈরি পোষাক রপ্তানী করে ১টি কম্পিউটার পায়। কিন্তু দেশের মধ্যে ১টি কম্পিউটারের জন্য তাকে ৫ একক তৈরি পোষাক ত্যাগ করতে হয়। সুতরাং আমদানীর ফলে তার ২ একক তৈরি পোষাক বাঁচে এবং এই ২ একক তৈরি পোষাক সে নিজে ভোগ করতে পারে বা এর কিছুটা রপ্তানী করে আরও কম্পিউটার আমদানী করতে পারে। উভয়ক্ষেত্রে তার মোট ভোগ বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে দেখানো যায় যে, ১ একক কম্পিউটার=৩ একক তৈরি পোষাক – এই বিনিময় হারে বাণিজ্যের ফলে আমেরিকাও লাভবান হয়।

## লেনদেনের ভারসাম্য

কোন দেশের লেনদেনের ভারসাম্য বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণতঃ এক বছরে, ঐ দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের সকল প্রকার অর্থনৈতিক লেনদেনের রীতিবদ্ধ বিবরণীকে বুঝায়। এখানে অধিবাসী বলতে শুধু ব্যক্তি বুঝায় না, সরকার এবং ফার্মও বুঝায় যদিও এই ফার্ম কোন বিদেশী সংস্থার শাখা হয়।

একটি দেশের লেনদেনের ভারসাম্য হিসাবে বিদেশীদের নিকট থেকে ঐ দেশের পরিশোধ ও প্রাপ্তি উভয়ই লিপিবদ্ধ করা হয়। বিদেশীদেরকে পরিশোধ করতে হয় এরূপ যে কোন লেনদেনের ভারসাম্য হিসাবে খরচ হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা হয় এবং এটিতে একটি ঋনাঙ্ক(–) চিহ্ন দেয়া হয়। বিদেশীদের নিকট থেকে প্রাপ্তির উদ্ভব হয় এরূপ যেকোন লেনদেন জমা হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা হয় এবং এটিতে একটি ধনাঙ্ক (+) চিহ্ন দেয়া হয়।

## লেনদেনের ভারসাম্যের বিভিন্ন খাত

লেনদেনের ভারসাম্য হিসাবকে কয়েকটি প্রধান খাতে ভাগ করা হয়। লেনদেনের ভারসাম্য হিসাবকে চারটি প্রধান খাতে ভাগ করা হয়েছে। যথা: চলতি হিসাব, মূলধন হিসাব, পরিসংখ্যানগত ক্রুটি এবং বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিবর্তন।

চলতি হিসাবে ঐসব লেনদেন অর্ন্তভুক্ত থাকে যেগুলো চলতি আয় সৃষ্টি বা চলতি আয় খরচের সঙ্গে চলতি হিসাব সংযুক্ত। চলতি হিসাবকে তিনভাগে ভাগ করা হয় - দ্রব্য বাণিজ্য, সেবাকর্মে বাণিজ্য এবং নীট অপরিশোধিত হস্তান্তর। আর্ন্তজাতিক সীমান্ত অতিক্রম করার সময় যে সকল বস্তু দেখা যায় এবং স্পর্শ করা যায়, দ্রব্য বাণিজ্যের মধ্যে তা অর্ন্তভুক্ত করা হয়। দ্রব্যের রপ্তানী ধনাত্মক দফা হিসাবে এবং দ্রব্যের আমদানী ঋণাত্মক দফা হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। রপ্তানী সাধারণত: এফওবি ভিত্তিতে হিসাব করা হয় অর্থাৎ পরিবহন, ইন্স্যুরেন্স খরচ ইত্যাদি অর্ন্তভুক্ত করা হয় না। তবে আমদানী সিআইএফ ভিত্তিতে হিসাব করা হয় অর্থাৎ দামের মধ্যে পরিবহন, ইন্স্যুরেন্স খরচ ইত্যাদি অর্ন্তভুক্ত করা হয়। দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীর স্থিতিকে দৃশ্যমান বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বা দ্রব্যসামগ্রীর বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বা সংক্ষেপে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলে।

সেবাকর্মে বাণিজ্যের মধ্যে অ-উপাদান সেবাকর্ম যেমন-জাহাজভাড়া, ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স সেবা, পর্যটকদের ব্যয় ইত্যাদি এবং উপাদান সেবাকর্ম যেমন-সুদ, মুনাফা এবং লভ্যাংশ যা উৎপাদনের উপাদান ব্যবহারের জন্য দেয়া হয় (বা পাওয়া যায়) অর্ন্তভুক্ত থাকে। যেহেতু সেবাকর্মে বাণিজ্য দেখা যায় না এবং স্পর্শ করা যায় না সেবাকর্মের আমাদনী ও রপ্তানীর স্থিতিকে অদৃশ্যমান বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলা হয়।

এক তরফা হস্তান্তর বা অপরিশোধিত হস্তান্তর বলতে একটি দেশের অধিবাসীদের ঐ সব প্রাপ্তিকে বুঝায় যা তারা "বিনামূল্যে" পায় এবং এর প্রতিদান স্বরূপ ভবিষ্যতে কোন কিছু প্রদান করতে হয় না। যেমন- বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের অর্থ প্রেরণ, বৈদেশিক সরকারের কাছ থেকে বিশুদ্ধ সাহায্য ইত্যাদি। বিদেশ থেকে প্রাপ্তি ও বিদেশে প্রদানের পার্থক্য নীট অপরিশোধিত হস্তান্তর হিসেবে দেখানো হয়।

দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান বাণিজ্য ও একতরফা হস্তান্তরের স্থিতির নীট মূলকে একত্রে চলতি হিসাবের ভারসাম্য বলা হয়।

**লেনদেনের ভারসাম্য হিসাব**

| দেনা (-) | | পাওনা (+) |
|---|---|---|
| | **চলতি হিসাব** | |
| দ্রব্য আমদানী | | দ্রব্য রপ্তানী |
| সেবাকর্ম আমদানী | | সেবাকর্ম রপ্তানী |
| নীট অপরিশোধিত হস্তান্তর | | |
| | **মূলধনি হিসাব** | |
| বিদেশে দেশের পরিসম্পদের নীট বৃদ্ধি | | দেশে বিদেশের পরিসম্পদের নীট বৃদ্ধি |
| | পরিসংখ্যানগত ক্রুটি | |
| | বৈদেশিক মূদ্রার মজুদের পরিবর্তন | |

## মূলধন হিসাব

একটি দেশের নাগরিক বা সরকার কোন বিদেশী নাগরিক বা সরকারকে কোন ঋণ দান করলে বা কোন সম্পদ ক্রয় করলে (ঋণাত্মক ভুক্তি) বা তাদের কাছ থেকে কোন ঋণ গ্রহণ করলে তা মূলধন হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকার বিদেশের কাছ থেকে ১ ডলার ঋণ নিলে সরকার তাদের কাছে একটি পরিসম্পদ বিক্রয় করে - ভবিষ্যতে সুদসহ ১ ডলার পরিশোধের প্রতিজ্ঞা করতে হবে। এরূপ লেনদেন মূলধন হিসাবে ঋণাত্মক ভুক্তি হিসাবে দেখা দেয় কারণ ঋণের অর্থ বাংলাদেশের পণ্য প্রাপ্তি বা মূলধনের অন্ত:প্রবাহ। মূলধন হিসাবের লেনদেন নানারূপ হতে পারে, যেমন-ব্যক্তিগত বা সরকারী লেনদেন, প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বা পত্রকোষ বিনিয়োগ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূলধন বা স্বল্পমেয়াদী মূলধন। মূলধন হিসাবের সকল আদান-প্রদানের নীট মূল্যকে মূলধন হিসাবের ভারসাম্য বলা হয় এবং এই ভারসাম্য ধনাত্মক হলে নীট মূলধন অন্তঃপ্রবাহ ঘটে এবং ঋণাত্মক হলে নীট মূলধন বহিঃপ্রবাহ ঘটে।

## পরিসংখ্যানগত ভুলত্রুটি

লেনদেনের ভারসাম্য হিসাবে যে লক্ষ লক্ষ পৃথক লেনদেন অর্ন্তভুক্ত করা হয় সে সবের পরিপূর্ণ ও নির্ভুল হিসাব পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। লেনদেনের হিসাব লিপিবদ্ধ করায় নানারূপ ভুলত্রুটি হয়, তথ্য পেতে অনেক সময় দেরী হয়, চোরাকারবার হয় বা অর্থ প্রদানের পরিমাণ কম করে দেখানো ইত্যাদি কারণে লেনদেনের হিসাবের দেনা ও পাওনার দিকে একেবারে সমান হয় না। এই সমতা আনার জন্য যে সমন্বয় প্রয়োজন সেটিকে পরিসংখ্যানগত ভুলত্রুটি হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়।

পরিশেষে যে দেশের লেনদেনের ভারসাম্য হিসাব বিবেচনা করা হয় সেদেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিবর্তন হতে পারে। মুদ্রার মজুদ তিন প্রকার হতে পারে - আমেরিকান ডলার, সোনা এবং আর্ন্তজাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে ঋনকৃত এসডিআরস। মনে রাখা দরকার যে, মুদ্রার মজুদ দেশের অভ্যন্তরে রাখা প্রয়োজনীয় নয়। বস্তুতঃপক্ষে অধিকাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের মজুদের কিছু অংশ বিদেশী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাবে জমা রাখে। লেনদেনের হিসাবের

অন্যান্য সকল দফার নীট মূল্যে প্রতিফলন ঘটে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিবর্তনে। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিবর্তন এবং অন্যান্য অর্ন্তভুক্ত দফার নীট মূল্যের মধ্যে যে তারতম্য তাই পরিসংখ্যানগত ভুলত্রুটি হিসাবে সনাক্ত করা হয়। লেনদেনের ভারসাম্যের হিসাব এমনভাবে করা হয় যে, এই চারটি দফার যোগফল শূন্য হয়।

## বাণিজ্যের ভারসাম্য

দ্রব্যের আমদানীকৃত রপ্তানীর (+) নীট মূল্যকে বাণিজ্যের ভারসাম্য বলা হয়। আমরা জানি যে লেনদেনের ভারসাম্য একটি দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের দ্রব্য, সেবাকর্ম, একপাক্ষিক হস্তান্তর, পরিসম্পদের লেনদেনের বিবরণ দেয়। সুতরাং বাণিজ্যের ভারসাম্য একটি দেশের আর্ন্তজাতিক লেনদেনের আংশিক চিত্র দেয়। তবুও বাণিজ্যের ভারসাম্যের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়- বিশেষত : দেশের সংবাদ মাধ্যমে এটির উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রচার মাধ্যমে গুরুত্ব পাওয়ার একটি কারণ অবশ্য দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী সংক্রান্ত উপাত্ত তুলনামূলকভাবে সহজে পাওয়া যায়। সেবাকর্ম বা পরিসম্পদের লেনদেনের উপাত্ত কিছুটা দেরীতে পাওয়া যায়।

বাণিজ্যের ভারসাম্যের অবস্থার ব্যাখ্যা কৌশলপূর্ণ হতে পারে। বাণিজ্যের ভারসাম্যের উদ্বৃত্তকে ভাল এবং ঘাটতিকে খারাপ বিবেচনা করা হয়। উদ্বৃত্তের অর্থ হচ্ছে বিদেশে আমাদের দেশের দ্রব্যের চাহিদা ভাল এবং আমাদের দেশের অধিবাসীরা দেশীয় পণ্য বেশী ক্রয় করছে। সুতরাং দেশীয় অর্থনীতি ভাল অবস্থায় আছে। অপর দিকে ঘাটতির অর্থ আমাদের দ্রব্য বিশ্ববাজারে যথেষ্ট প্রতিযোগিতামূলক নয় এবং আমাদের জীবনযাপনের মান রক্ষা করার জন্য কিছু পরিবর্তন অবশ্য দরকার। এই বিশ্লেষণকে সঠিক বলা যায় যদি বিশ্ববাজারে আমাদের দ্রব্যের চাহিদার বৃদ্ধি বা হ্রাসের ফলে বাণিজ্যের ভারসাম্যে এই উদ্বৃত্ত বা ঘটতি হয়। কিন্তু অন্যান্য কারণেও বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস খাতে মুনাফার সুযোগ নেয়ার জন্য বিদেশী বিনিয়োগ আসতে পারে। এজন্য প্রচুর মূল্যবান যন্ত্রপাতি আমদানী করতে হবে এবং ফলে বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি হবে। কিন্তু এ ধরনের ঘাটতিতে উদ্বিগ্ন হলে ভুল করা হবে। কারণ, এই অতিরিক্ত বিনিয়োগ দেশের উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

## অবাধ বাণিজ্য

যদি আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানী ও রপ্তানীর উপর কোনরূপ বাধা নিষেধ আরোপ না করা হয় তাহলে এরূপ বাণিজ্যকে অবাধ বাণিজ্য বলে। অবাধ বাণিজ্যে পণ্য অবাধে এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমনাগমন করে। প্রত্যেক দেশ অবাধে পণ্য আমদানী করে তার চাহিদা মেটাতে পারে এবং প্রত্যেক দেশের রপ্তানী অবাধে অন্যদেশে প্রবেশ করতে পারে।

**অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে যুক্তিসমূহ :** অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলো দেখানো হয়ে থাকে ঃ-

**ক. আর্ন্তজাতিক বিশেষায়ন ঃ** প্রত্যেক দেশের সম্পদ ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য থাকে। সুতরাং প্রত্যেক দেশ বিভিন্ন পণ্য বিভিন্ন খরচে উৎপাদন করতে পারে। একটি দেশ অন্য দেশের তুলনায় কম খরচে যে সব পণ্য উৎপাদন করতে পারে সেসব পণ্য উৎপাদন করা উচিত এবং এসব পণ্য বিনিময় করে যেসব পণ্যের উৎপাদন খরচ বেশি সেসব পণ্য আমাদনী করা উচিত। এভাবে বিশেষায়নের ফলে প্রত্যেক দেশ তার সীমিত সম্পদ থেকে বেশি পরিমাণে আয় লাভ করতে সক্ষম হয়।

**খ. অবাধ বাণিজ্য ও দক্ষতা ঃ** বাণিজ্যে বাধানিষেধ আরোপ করলে তা দক্ষতা ক্ষতি সৃষ্টি করে। আমদানীর উপর শুল্ক আরোপ করলে ভোক্তাদেরকে বেশি দাম দিয়ে পণ্যটি ভোগ করতে হয়। আবার পণ্যটি উৎপাদনে এই দেশের তুলনামূলক অসুবিধা থাকায় এটি উৎপাদনে বিদেশের তুলনায় বেশি পরিমাণ উপকরণ ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার হয়। অবাধ বাণিজ্য এসব ক্ষতি দূর করে এবং জাতীয় কল্যাণ বৃদ্ধি করে।

**গ. অবাধ বাণিজ্য ও উৎপাদন খরচ ঃ** সংরক্ষণের ফলে শিল্পে প্রতিযোগিতা হ্রাস পায় এবং মুনাফা বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত মুনাফার সুযোগ নেয়ার জন্য দেশীয় বাজার ছোট হওয়া সত্ত্বেও অনেক ফার্ম পণ্যটি উৎপাদন করে। ফলে অর্থনীতি বর্ধিত উৎপাদনজনিত ব্যয়-সংকোচ এর সুবিধা লাভে বঞ্চিত হয়। অবাধ বাণিজ্যে প্রতিযোগিতার ফলে অদক্ষ ফার্ম শিল্প ত্যাগ করে এবং স্বল্প সংখ্যক দক্ষ ফার্ম উৎপাদনে নিয়োজিত থাকে। উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত প্রতিদানের কারণে স্বল্প সংখ্যক ফার্ম অনেক পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করায় উৎপাদন খরচ কম পড়ে।

**ঘ. রাজনৈতিক যুক্তি ঃ** কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে শুল্ক ও রপ্তানী ভুর্তকী জাতীয় কল্যাণ বৃদ্ধি করে। কিন্তু সংরক্ষণ ও ভর্তুকী যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত বিশেষ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর তৎপরতার জন্য সরকার সেসবক্ষেত্রে এগুলোর ব্যবহার করতে পারে না। বরং বিশেষ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী যেসব ক্ষেত্রে সংরক্ষণ বা ভর্তুকী দাবী করে সেসব ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করতে হয়। ফলে অর্থনীতির কল্যাণ হ্রাস পায়। এজন্য সাধারণভাবে অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করা উচিত যাতে কোন বিশেষ গোষ্ঠী চাপ দিয়ে সরকারের কাছে অনাকাংক্ষিত সুবিধা আদায় করতে না পারে।

**অবাধ বাণিজ্যের বিপক্ষে যুক্তিসমূহ** ঃ অবাধ বাণিজ্যের বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহ দেখানো হয়ে থাকে ঃ-

**ক. বাণিজ্য শর্ত যুক্তি ঃ** অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসরণ না করে কাম্য শুল্ক ও রপ্তানী কর আরোপ করে একটি দেশ তার বাণিজ্য শর্তের উন্নতি করতে সক্ষম হয়। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এযুক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ ছোট দেশসমূহ তাদের আমদানী ও রপ্তানীর দাম প্রভাবিত করতে পারে না এবং ফলে শুল্ক বা অন্যান্য নীতির মাধ্যমে তাদের বাণিজ্য শর্তের উন্নতি করতে পারে না। বড় দেশগুলো তাদের আমদানী ও রপ্তানরি দাম প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু তারা শুল্ক আরোপ করলে পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে অন্য দেশও এরূপ ব্যবস্থা নিতে পারে।

**খ. দেশীয় বাজার ব্যর্থতার যুক্তি ঃ** যদি কোন দেশীয় বাজার যথাযথভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্য নীতি ত্যাগ করা অর্থনীতির জন্য সঠিক কল্যাণকর হতে পারে। যেমন- মনে করি, দেশের শ্রম বাজার যথাযথভাবে কাজ করে না (বেকারত্ব থাকতে পারে) এরূপ অবস্থায় সরকার শ্রম বাজারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য বাণিজ্যে সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করতে পারে। তবে বাজার ব্যর্থতা সমস্যা নিরসনের জন্য বাণিজ্য নীতি ব্যবহার না করে বিশেষ বাজারের জন্য নির্দিষ্ট নীতি ব্যবহার করা শ্রেয়। যেমন-শ্রম বাজারে নিয়োগ বৃদ্ধির জন্য আর্থিক বা রাজস্ব নীতি নেয়া যায়।

**গ. অনুন্নত দেশসমূহের ক্ষেত্রে যুক্তি ঃ** অবাধ বাণিজ্য অনুন্নত দেশের শিল্পায়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। কারণ, এসব দেশের নতুন শিল্প উন্নত দেশের প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না। এজন্য শিশু শিল্পকে সংরক্ষণ করা উচিত। অনেকের মতে বর্তমান আর্ন্তজাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অন্যায্য এবং উন্নত বিশ্বের সম্পদের কারণে অনুন্নত বিশ্বে দারিদ্র বিদ্যমান। অসব উন্নয়নের কুফল থেকে রক্ষা করার জন্য অনুন্নত দেশসমূহের অবাধ বাণিজ্য নীতি ত্যাগ করা প্রয়োজন।

## সংরক্ষণ

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে আমদানী ও রপ্তানীর নিয়ন্ত্রণকে সংরক্ষণ বলে। সংরক্ষণের মাধ্যমে সাধারণতঃ বিশেষ বিশেষ পণ্যের আমদানী বিভিন্ন মাত্রায় নিরুৎসাহিত করা হয় এবং বিশেষ বিশেষ পণ্যের রপ্তানী বিভিন্ন মাত্রায় উৎসাহিত করা হয়। শুল্ক এবং নানারূপ অশুল্ক বাধা যেমন – কোটা, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির মাধ্যমে আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং রপ্তানী কর বা ভর্তুকীর মাধ্যমে রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

**সংরক্ষণের সপক্ষে যুক্তি** ঃ সংরক্ষণের সপক্ষে সাধারণত: নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহ দেখানো হয়ে থাকে ঃ-

**ক. শিশু শিল্পের সংরক্ষণ যুক্তি ঃ** কোন দেশ একটি শিল্প অন্য দেশের তুলনায় দেরীতে শুরু করতে পারে। অবাধ বাণিজ্য অবস্থায় এই শিল্পটি বিদেশের সুপ্রতিষ্ঠিত এবং কম খরচে উৎপাদনক্ষম শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম হবে না। এ অবস্থায় শিশু শিল্পটাকে ততদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ দেয়া উচিত যতদিন পর্যন্ত না এটি প্রতিযোগিতামূলক হয়।

**খ. আমদানী মূল্য হ্রাস ঃ** আমাদনীর উপর শুল্ক আরোপ করলে এটির দাম বেড়ে যায় এবং ফলে আমাদানী চাহিদা কমে যায়। কোন বড় দেশ আমদানীর উপর শুল্ক আরোপ করলে এর চাহিদা এত কমে যেতে পারে যে আর্ন্তজাতিক বাজারে পণ্যটির দাম হ্রাস পেতে পারে। সুতরাং শুল্ক আরোপ করে বড় দেশ কম দামে আমদানী করতে ও কল্যাণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

**গ. প্রতিরক্ষাঃ** কোন কোন শিল্প দেশের প্রতিরক্ষার জন্য অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়। এসব পণ্য বিদেশ থেকে কম খরচে পাওয়া যায় কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে এসব পণ্যের যোগান পাওয়া দুরূহ হতে পারে। এরূপ অবস্থায় প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত শিল্পকে সংরক্ষণ দিতে হয়। তবে এসব ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষার সঙ্গে ক্ষীণতম যোগাযোগ আছে এরূপ শিল্পও সংরক্ষণ চাইতে পারে।

**ঘ. বিশেষ বিশেষ শিল্পের সংরক্ষণ ঃ** অবাধ বাণিজ্য সমগ্র দেশের জন্য লাভজনক হলেও এর ফলে বিশেষ বিশেষ শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। যে সকল শিল্প সুলভ বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতায় হুমকির সম্মুখীন হয় সেসব শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ী ও শ্রমিকগণ শিল্পের সংরক্ষণ দাবী করে। সংরক্ষণের ফলে এসব শিল্প টিকে থাকতে সক্ষম হয়।
মনে রাখা দরকার যে সংরক্ষণের ফলে দ্রব্যের দাম বাড়ে। ফলে ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং উৎপাদন দক্ষতার ক্ষতি হয়। এ অবস্থায় বিপন্ন শিল্পকে রক্ষার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। শিল্পটাকে প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য কারিগরী সাহায্য এবং আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা যায়। শিল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে যেসব শ্রমিক চাকুরী হারায় তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা যায়। যেমন- পুন; ট্রেনিং ব্যবস্থা, বেকারত্ব ভাতা ইত্যাদি বা বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা নেয়া যায়।

**ঙ. রাজস্ব উদ্দেশ্য ঃ** আমদানী শুল্ক সরকারের রাজস্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তবে বর্তমানে উন্নত দেশে সরকারী আয়ের অতি সামান্য অংশ বাণিজ্যের উপর আরোপিত কর থেকে আসে। অবশ্য অনুন্নত দেশে যেমন-বাংলাদেশ, বাণিজ্যের উপর কর এখনও সরকারী আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

**চ. অর্থনৈতিক মন্দার মোকাবেলা ঃ** অর্থনৈতিক মন্দার সময় দেশীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। আমাদনী শুল্ক আরোপের ফলে পন্যের দাম বৃদ্ধি পায়। ফলে বিদেশী পণ্যের চাহিদা হ্রাস এবং দেশীয় পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে দেশীয় আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। তবে যদি এক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ তাদের আমদানীর উপর অনুরূপ শুল্ক আরোপ করে তাহলে মন্দাবস্থা আরো দীর্ঘায়িত এবং প্রকট হতে পারে।

**ছ. লেনদেনের ভারসাম্য ঘাটতি দূরীকরণ ঃ** রপ্তানীর তুলনায় আমদানী বেশি হওয়ার ফলে একটি দেশে লেনদেনের ভারসাম্য ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এরূপ অবস্থায় সরকার আমদানী হ্রাস করে ঘাটতি দূর করতে পারে। তবে দেখা গেছে যে লেনদেনের ভারসাম্য ঘাটতি দূর করার জন্য অন্যান্য নীতি যেমন-আর্থিক নীতি, রাজস্ব নীতি বা মুদ্রার অবমূল্যায়ন অধিক কার্যকর।

**জ. সস্তা বিদেশী শ্রমের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ঃ** উন্নত দেশসমূহে বলা হয় যে, উন্নয়নশীল দেশসমূহে শ্রম এত সস্তা যে তাদের উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে উন্নত দেশে উৎপাদিত পণ্য প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না। আবার উন্নয়নশীল দেশসমূহে বলা হয় যে, উন্নত বিশ্বের দেশগুলো প্রযুক্তিগতভাবে এত উন্নত যে তাদের তৈরী পণ্যের সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশের পন্য প্রতিযোগিতায় টিকবে না। প্রকৃতপক্ষে উভয় যুক্তিই তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্বের ভিত্তি ছাড়াই করা হয়। তুলনামূলক সুবিধা তত্বের সাহায্যে দেখানো যায় যে দুটি অসমভাবে উন্নত দেশও পরস্পরের সঙ্গে বাণিজ্য থেকে লাভ পেতে পারে।

**<u>সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তিসমূহ</u> ঃ** সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তিসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ-

**ক. বিশেষায়নের অন্তরায় ঃ** সংরক্ষণের বিপক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হল এটি তুলনামূলক সুবিধার ভিত্তিতে আর্ন্তজাতিক বিশেষায়নের পথে বাধা স্বরূপ। যে সকল শিল্পে তুলনামূলক সুবিধা আছে শ্রম এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সেসব শিল্পে নিয়োজিত না হয়ে সংরক্ষিত শিল্পে নিয়োজিত হয়। ফলে সম্পদের কাম্য সদ্ব্যবহার হয় না এবং শিল্প আয় যা হওয়া উচিত তার চেয়ে কম হয়।

**খ. অর্থনৈতিক দক্ষতা ক্ষতি ঃ** সংরক্ষণের ফলে পন্যের দাম বৃদ্ধি পায়। বেশি দামে দ্রব্য ক্রয় করতে হয় বলে। ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অপরদিকে বিদেশে যে পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করে পণ্যটি উৎপাদিত হত দেশের মধ্যে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করে পণ্যটি উৎপাদন করতে হয় বলে প্রকৃত সম্পদের অপচয় হয়।

**গ. দুর্বল শিল্পের অস্তিত্ব ঃ** শিশু শিল্প প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে না পৌছানো পর্যন্ত এটি সংরক্ষণের প্রয়োজন স্বীকার করা হয়। কিন্তু সংরক্ষণের সুবিধার ফলে এসব শিল্প দক্ষতা বৃদ্ধির প্রেরণা বোধ করে না। ফলে শিশু শিল্প চিরকাল শিশু থেকে যায়, কখনও পূর্ণবর্ধিত হয় না।

**ঘ. অন্যান্য অসুবিধা ঃ** সংরক্ষণের জন্য বিশেষ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠির জন্ম হয়। তারা সরকারের কাছে লবিং করে বা অসাধু পদ্ধতিতে নিজেস্ব বিল্পের সংরক্ষণ নিশ্চিত করে। এর ফলে প্রকৃত সম্পদের অপচয় হয়।

***Source:*** *www.ebookbou.edu.bd*